দ্বিতীয় অধ্যায়

দেশকালের প্রেক্ষিত ঃ উপন্যাসের পরিমন্ডল

সাহিত্য সমাজ বিচ্ছিন্ন কোনো অ-মূল বৃক্ষ নয়, দেশ-কালের গন্ডী আঁকা ভূমিতে শেকড় সঞ্চালিত করেই তা পত্র-পল্লবে বিকশিত হয়ে ওঠে। শিল্প-সাহিত্যের বিচারের ক্ষেত্রে তাই লেখার তথা লেখকের কালটিকে স্মরণে রাখতে হয়। কেননা একজন সামাজিক মানুষ হিসেবে তিনি স্ব-কালের আশা-নিরাশার কার্যকারণ সম্পর্কজনিত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নির্মাণ করেন শিল্পের অবয়ব। মোহিতলাল মজুমদার যথার্থই বলেছেন — "যিনি সাহিত্য সৃষ্টি করিবেন, তিনি দেশ-কালকে উপেক্ষা করিয়া যত বড় কল্পনাকেই আশ্রয় করুন না কেন, তাহা জীবন ও প্রাণময় হইবে না। সত্যকে আমরা দেশকালের প্রত্যক্ষ রূপের মধ্যেই উপলব্ধি করি — সেই অনুভূতিই প্রতিভার শক্তি বলে শাশ্বত ও সার্ব্বজনীন হইয়া উঠে।" ('সাহিত্য ও যুগধর্ম', "সাহিত্য বিতান", মোহিতলাল মজুমদার, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, ১৩৬৮, পৃ: ৩২৩ - ৩২৪) সাহিত্যকে তাই সমাজের দর্পণ বলে চিহ্নিত করা হয়। অর্থাৎ দেশ ও সমকালের ছবি সাহিত্যের পাতায় ফুটে উঠতে দেখা যায়। উপন্যাস সাহিত্য-শাখার অপেক্ষাকৃত আধুনিক শাখা। এক্ষেত্রে "ঔপন্যাসিকের বিষয়জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে তার সময়জ্ঞান, সমাজজ্ঞান, ইতিহাসজ্ঞান এবং ব্যক্তি-মানসের জ্ঞান এই সমস্তের সারাৎসার"('উপন্যাসের কালান্তর', সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ, ১৯৮৮, পৃ: ৩৭) উপন্যাসে গড়ে ওঠার পেছনে সাহায্য করে। অর্থাৎ উপন্যাস-শিল্পও দেশ-কালের বাইরে নয়, বরং বলা ভালো সমাজ-মানুষের যে সমস্যা তাকে আত্মস্থ করেই তার বিকাশ। "ঔপন্যাসিক উপন্যাসের মাধ্যমে তাঁর সময় ও ইতিহাস, নিজ অভিজ্ঞতা ও জীবনের মধ্যের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কটিকে একটি টেক্সট বা বয়ানে আকরিত করেন।" ('উপন্যাস রাজনৈতিক', পার্থপ্রতীম বন্দ্যোপাধ্যায়, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ১৯৯১, পৃ: ১১) ফলে রমেশচন্দ্র সেনের উপন্যাস আলোচনা করতে গিয়ে তাই তাঁর সমকালীন দেশকালের পটভূমি ও সেই সঙ্গে অন্যান্য লেখকদের উপন্যাস তথা উপন্যাসের পরিমন্ডলকে জেনে নিতে হয়।

রমেশচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত গল্প 'শরতের মেঘ'। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় এটি ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা হয়েছিল। এবং এই সময় থেকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর জনপ্রিয় গল্পগুলি একে একে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৩৬ সালে 'দেশ' পত্রিকায় উপন্যাস 'টিকি বনাম প্রেম' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ পায়। ১৯৪৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'শতাব্দী'। মৃত্যুর আগে লেখা 'অপরাজেয়' প্রকাশিত হয়

১৯৬০ সালে। ১৯২৮ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত ১২১টি ছোটগল্প এবং ছোট-বড় মোট ১৩টি উপন্যাস তিনি লেখেন। এই দিক থেকে ১৯২৮ সাল তাঁর সাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রকাশের কাল।

১৯২৮ - এ রমেশচন্দ্র সেন লেখক রূপে আত্মপ্রকাশ করলেও সেই সময় থেকে দশ বছর আগে ১৯১৮র কোন এক সময় 'সাহিত্য সেবক সমিতি'র অধিবেশনে তিনি 'রাজার বানর' গল্পটি পড়েন। সভাপতি বীরবল সেই সম্পর্কে নিরুত্তর থাকায় তিনি আহত হন। এবং লেখক হিসেবে নিজের সীমাবদ্ধতা অনুভব করেন। ফলে ১৯১৮ থেকে ১৯২৭ এই দশ বছর তিনি সারস্বত সাধনায় অনুশীলন কর্মে আত্মমগ্ন হন। এবং এই কাল সীমায় তাঁর জীবনাদর্শ তথা সাহিত্যাদর্শ গড়ে ওঠে বলে আমরা ধরে নিতে পারি। কেননা মানুষের জীবনবোধ সম্পর্কিত যা কিছু গড়ন তা সাধারণত ৩০ বছর সময় সীমার মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে বলে মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন।

১৯১৮ থেকে ১৯২৮ — এই মধ্যবর্তী সময়ে এ দেশে 'কল্লোল পত্রিকাকে অবলম্বন করে একটি সাহিত্যিক আন্দোলন বিশেষ ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠল। ১৯২৩ সালে প্রকাশিত 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে নবীন সাহিত্য স্রষ্টাদের আত্মপ্রকাশ ঘটল। সেই সব লেখকদের অনেকেই যে সাহিত্য সেবক সমিতির অধিবেশনে যাতায়াত করতেন সে সম্পর্কে রমেশচন্দ্র সেনের সাক্ষ্য আছে — "শৈলজানন্দ, অচিন্ত্য প্রমুখ সাহিত্য রথীরা সমিতির নিয়মিত পাক্ষিক সভায় গল্প প্রবন্ধ ও কবিতা পড়তেন, আলোচনা করতেন। খ্যাতিমানদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গল্প পড়েছিলেন শৈলজানন্দ। তিনিই তখন ছিলেন সমিতির মধ্যমণি। 'কল্লোল', 'কালিকলম' বাঙলা সাহিত্যে যে ভাব-বন্যা বইয়ে দেয় — সেই বন্যার অন্যতম উৎস ছিল সাহিত্য সেবক সমিতি।" ('কাজলের কৈফিয়ৎ ও অন্য প্রবন্ধ', রমেশচন্দ্র সেন, প্রকাশক — রমেশচন্দ্র সেনমশতবার্ষিকী সমিতি, পৃ: ১৩)

এখানে 'উৎস' বলতে লেখক আলোচনার স্থল বুঝিয়েছেন। এর থেকে আমরা বলতে পারি রমেশচন্দ্র কল্লোলের ভারধারার সঙ্গে সম্যক ভাবে পরিচিত ছিলেন, সে কথায় পরে আসছি। বাংলার ইতিহাসে ১৯০৫ সালের ঐতিহাসিক গুরুত্ব স্বতন্ত্র। আমরা জানি ১৯০৫ সালে, তৎকালীন গভর্নর লর্ড কার্জন বাংলা ভাগের পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু সেদিন তাঁর সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বেয়াল্লিশ বছর বাদে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট সেদিনের সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয় ভারত ভাগের মধ্য দিয়ে। এক সময় বঙ্গভঙ্গ বিষয়টি মেনে না নেওয়া আর স্বাধীনতার নামে শেষ পর্যন্ত তা মেনে নেবার মধ্যে একটি

জাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী মূর্ত হয়ে ওঠে। মধ্যবর্তী চারটি দশকে এ দেশের রাজনৈতিক - আর্থনীতিক - সামাজিক - সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের যে নানা মোচড়, তারই কার্যকারণ সম্পর্কের অব্যবহিত পরিণাম হল ভারত তথা বাংলা ভাগ। রমেশচন্দ্রের উপন্যাস সাহিত্যের দিকে লক্ষ রেখে স্বাধীনতা পর্যন্ত সময়সীমার সামাজিক ইতিহাসের কথা এখানে উল্লেখ করা হবে।

কার্জন যে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা করেছিলেন তার মূলে ছিল ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের ভবিষ্যৎ প্রশস্ত করা। দেশকে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে সেই আত্মঘাতী বৈরীতার ফাঁকে তারা তাদের শোষণ বজায় রাখবে — এই ছিল উদ্দেশ্য। কিন্তু সেদিন বাঙালী ইংরেজের কূটকৌশলী দূরভিসন্ধি ধরতে পেরেছিল। পরিকল্পিত ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে এবং প্রতিরোধে সমস্ত মানুষ সেদিন সামিল হয়েছিল। রাখীবন্ধন উৎসব, অরন্ধন, বিলেতী বয়কট, স্বদেশী ভান্ডার স্থাপন ইত্যাদি বিবিধ আয়োজনে জাতি সেদিন "নতুন করিয়া জাগ্রত" ('আমার কালের কথা', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫৯, পৃ: ৩৮) হয়ে উঠেছিল। ফলে ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হয়ে বঙ্গ ভঙ্গ রদ করে (১৯১১)।

বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা প্রতিহত করতে পারায় বাঙালি-জাতি আশার আলো দেখতে পেয়েছিল। লক্ষ্যে জয়যুক্ত হওয়াই শুধু নয়, সেই সঙ্গে আর্থ-সামাজিক দিক থেকে যে পরিবর্তন সূচিত হয় তাও অতি উল্লেখ যোগ্য বিষয়। যেমন ইংরেজী শিক্ষার পাশাপাশি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মত দেশীয় শিক্ষার প্রবর্তন, বিলেতী বয়কটের ফলে এদেশীয় কুটির শিল্পের পুনরুজ্জীবন, যুবসমাজের মধ্যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলবার এক অদম্য সাড়া জেগে ওঠা ইত্যাদি। তবে স্বদেশী জোয়ার জাত আশা যে অচিরে নিরাশায় পর্যবসিত হয়ে যায়, ইতিহাস সে কথারই সাক্ষ্যবাহী। দ্বি-জাতি-তত্ত্ব মেনে না নেবার মানসিকতায় কিছু দিন বাদেই চোরা স্রোত নামে। শিল্প-শিক্ষা-চাকরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ায় সরকারের বিশেষ নজর কাড়ার লক্ষ্যে ১৯০৬ সালে গঠিত হয় মুসলীম লীগ। আন্দোলনের পীঠস্থান কলকাতা থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত হয় দিল্লীতে, ১৯১১ সালে। তার কিছু দিন পরেই শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন, তদুপরি ব্যাপক সংখ্যক যুবক সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেওয়ার ফলে কৃষিকাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শষ্যহীনতা, দুর্মূল্য ইত্যাদি কারণে এক দশক যেতে না যেতেই এদেশের সমাজ জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' প্রবন্ধে প্রমথনাথ বিশী যথার্থই বলেছেন, "বাঙালীর মানসিক জগতে স্বদেশী আন্দোলন প্রকান্ড একটি চিহ্ন, ইহাকে বলা যায়

বাঙালীর সংস্কৃতির water-shed — ইহার দুই দিকে সংস্কৃতির দুই বিভিন্ন মূর্তি, একদিকে আশা, অন্য দিকে আশা ভঙ্গ, একদিকে উদ্যম ও অন্য দিকে অবসাদ; একদিকে আত্মপ্রত্যয়, অন্যদিকে আত্ম-হেনাস্থা'' ('কথা সাহিত্যিক জগদীশ গুপ্ত', ডঃ প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়, এডুকেশন ফোরাম, ২০০১, পৃঃ ২৪) মুসলীম লীগের প্রতিষ্ঠা, রাজধানীর স্থানান্তর, চরমপন্থীদের ব্যর্থতা, ডোমিনিয়নের প্রতিশ্রুতি, রাওলাইট আইন, জালিয়ান ওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড আশাভঙ্গের এক একটি দিক।

স্বদেশী আন্দোলন-পর্বেই ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেস নরমপন্থী ও চরমপন্থী এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র মিত্র প্রমুখরা নিয়মতান্ত্রিক পথে দাবী দাওয়া আদায়ের পক্ষপাতী ছিলেন। অপর দিকে গুপ্ত হত্যা, শাসনকার্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ইত্যাদির পথে লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার দলে ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত, বালগঙ্গাধর তিলক, বিনয়-বাদল-দীনেশ-বাঘাযতীন প্রমুখরা একমত হন। যাদেরকে আমরা চরমপন্থী বলে চিহ্নিত করে থাকি। শুধু বাংলাদেশে নয়, পাঞ্জাব মহারাষ্ট্রেও এদের আদর্শ ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে। বিদেশেও চরমপন্থীদের শাখা গড়ে ওঠে। ইংলন্ডবাসী হরদয়াল ''১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আগমন করেন এবং প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের সহযোগিতায় 'গদর সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন।'' ('ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস', সুপ্রকাশ রায়, বুক ওয়ার্ল্ড, ১৯৯৬, পৃঃ ৩৮০) জার্মানির সহযোগিতায় বিপ্লবীরা এদেশে অস্ত্রশস্ত্রও আনবার চেষ্টা করে। কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টা, নানা স্থানে গুপ্ত সমিতি গঠন ও ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে অতর্কিত ভাবে আঘাত হানবার প্রচেষ্টা এ দেশে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিপ্লব প্রচেষ্টার উদাহরণ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা ব্যর্থ হয়ে যায়। একদিকে নরমপন্থীদের সমর্থন লাভ করতে না পারা, ব্যাপক জনসাধারণের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা অন্যদিকে সরকারের দমন-পীড়ন সেই ব্যর্থতার পেছনে কাজ করেছে। যে পরিমাণ গণ-সমর্থন তাদের প্রাপ্য ছিল, তাও মেলে নি। অগ্নিযুগের বিপ্লব প্রচেষ্টাকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করেন নি। 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) এবং 'চার অধ্যায়' (১৯৩৫) উপন্যাস দুখানিতে তাঁর মনোভাব পরিষ্কার ভাবে ধরা পড়েছে। আবার শরৎচন্দ্রের মতো লেখকের সেই বিপ্লববাদের প্রতি আশ্বাস-বাণী নতুন বিন্যাসে উঠে এসেছে 'পথের দাবী' উপন্যাসে। রমেশচন্দ্র সেন জীবন সায়াহ্নে বসে সেই যুগের নস্টালজিয়ায় পৌঁছে যান। রোমান্টিক দৃষ্টিতে সেই সব বিপ্লবীদের ও বিপ্লববাদের ছায়ায় রচনা করেন 'সাগ্নিক' (১৯৫৯)।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় গান্ধীজী এদেশের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন। যুদ্ধ শেষে স্বরাজ মিলবে — তাঁর এমন আশ্বাস-বাণীতে আপামর ভারতবাসী প্রতীক্ষায় ছিল। অতঃপর ইংরেজের চরম

বিশ্বাস ঘাতকতা এবং অকথ্য অত্যাচার ও হত্যা লীলার প্রতিবাদে সবাই গর্জে ওঠে। শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। স্কুল-কলেজ-অফিস-আদালত-কল-কারখানা সর্বত্র সেই আন্দোলনের ব্যপ্তি পরিলক্ষিত হয়। তুরস্ক সরকারের পতনের প্রতিবাদে এদেশের মুসলমান সমাজও সাগ্রহে অংশীদার হয়। খিলাফৎ আন্দোলন শুরু হয়। সেদিনের সেই বিপুল গণজোয়ারকে গান্ধীজী চৌরিচৌরার (১৯২২) সামান্য ঘটনায় প্রতিহত করেন। আন্দোলন তুলে নেন। যুবচিত্তে তার প্রতিক্রিয়া কতটা হতাশাব্যাঞ্জক তা নজরুলের একটি চিঠি থেকে পরিস্কার হয়ে যায়। তিনি সৌম্যেন্দ্র নাথ ঠাকুরকে লিখেছিলেন —

"মন আমার গভীর ভাবে ব্যথিত হল আন্দোলন বন্ধ হয়ে যাওয়াতে, কি রকম যেন মনের ভিতর সব এলোমেলো হয়ে গেল। ... হাজার হাজার লোকের মুখে যে আলো ফুটে উঠেছিল, নিভে গেল সে আলো" ('নজরুল : একটি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব', শান্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, নবপত্র প্রকাশন, ১৯৯৩, পৃঃ ২৮) ১৯২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত স্বরাজ পার্টি ক্ষীণসূত্রে মুক্তির পথ দেখিয়েছিল, তবে তার মূলে যতটা না রাজনীতিক আদর্শ ছিল, তার থেকেও বড় হয়ে উঠেছিল দেশবন্ধুর ব্যক্তি-সত্তার প্রভা। যার ফলে তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে সে আন্দোলনও সম্প্রসারিত হতে পারে নি।

রাজনৈতিক লক্ষ্যের দিক থেকে এই আশাভঙ্গের যুগে অর্থনীতির বিপর্যয়ও লক্ষণীয় বিষয়। এ প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর পানিগ্রাহী লিখেছেন — "১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ভারত সরকার যুদ্ধে ব্যয় করেছিল ১২,৭৮,০০,০০০ পাউন্ড। এছাড়াও, ভারতবাসীর কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল ২১,০০,০০০ পাউন্ড। এছাড়া ভারতবাসীরা নগদে দশ কোটি পাউন্ড ব্রিটিশ সরকারকে দান করেছিল। বিপুল পরিমান ব্যয়ের ফলে ভারতের জাতীয় ঋণের পরিমাণ ৩০ শতাংশ বেড়ে যায়। বিশাল সৈন্যবাহিনীর বেতন, রসদ ও যাতায়াতের খরচও ভারত সরকারকে বহন করতে হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতের জনবল ও অর্থ-সম্পদকে তার নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে, ঋণের বিশাল বোঝার সবটুকুই প্রায় দেশের দরিদ্র সাধারণ মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিল।" ('*প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও সমকালীন ভারতের মুক্তি আন্দোলন*', ডঃ তারাশঙ্কর পানিগ্রাহী, ভারতী বুকস্টল, ১৩৯১, পৃঃ ৪)

ফলতঃ উপনিবেশিক ভারতবর্ষকে যুদ্ধের রসদ সংগ্রহের কাজে ব্যবহার করায় যে বিরাট পরিমাণ ঘাটতি এদেশের অর্থনীতির ওপর চেপে বসে তাতে কর্মহীনতা, ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস ইত্যাদি দেখা দেয়। দারিদ্র্য-পীড়িত মানুষের শুভাশুভবোধ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বিশের দশকের এই সময়-পটে বাংলা সাহিত্যে

'কল্লোল' (১৯২৩) গোষ্ঠীর আবির্ভাব। উনিশ শতকে বাংলাদেশের ভাবজীবনে যত আঘাতই লাগুক না কেন তাতে সামাজিক ও পারিবারিক আদর্শবোধে ছিল সংহত ও অখন্ড প্রত্যয়। মানবতাবোধে তা উদ্দীপিত। বিশ শতকে সময়ের অন্তর্ঘাতে সেই সব প্রত্যয়গুলি ধ্বসে গেল। সময়-বাহিত সমাজের সেই ভাবসত্তাকে 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'প্রগতি' ইত্যাদি লেখকগোষ্ঠীর রচনায় লক্ষ্য করা গেল। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় — "... বর্তমান বাংলা দেশে জীবন সংগ্রামে যে কঠোর প্রতিযোগিতা চলেছে, তাকে মুখের গ্রাস নিয়ে কাড়াকাড়ি বললে অত্যুক্তি হয় না। দারিদ্র্যের তান্ডব নৃত্যের নিষ্ঠুর পদাঘাতে কোথায় উড়ে যাচ্ছে ধর্ম, সমাজ, স্বাস্থ্য, আনন্দ, প্রাণ, আয়ু — ইহকাল-পরকাল সব।" (বুদ্ধদেব বসু, অতি আধুনিক বাঙলা সাহিত্য, কল্লোলে সংগৃহীত) রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা করে, সচেতন প্রয়াসে তাঁরা সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহে নিবিষ্ট হলেন। বস্তি জীবন থেকে শুরু করে গণিকাপল্লীর ছবি তাঁদের লেখায় ফুটে উঠল। ইতিপূর্বে কথ্য ভাষার যে সব শব্দাবলী সাহিত্যে স্থান পায় নি, এবার অনায়াসেই ব্যবহৃত হল। গোকুল নাগ, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখরা যুগের প্রেক্ষাপটে সাহিত্যাদর্শকে মেলাবার প্রয়াসে প্রবৃত্ত হলেন।

বিশ শতকের প্রথম পর্বের যৌবন-যন্ত্রনা ও যুব সম্প্রদায়ের নিঃসঙ্গ হৃদয়ের হাহাকার প্রথম শুনিয়েছিলেন নজরুল ইসলাম। তাঁর 'বাউন্ডুলের আত্মকাহিনী' গল্পটিতে। গল্পটি ১৩২৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'সওগত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর দুটি গল্পগ্রন্থ 'ব্যথার দান'(১৯২২) ও 'রিক্তের বেদন'(১৯২৫) এ যুগের হাহাকার ফুটে উঠেছে, নায়কেরা বোহেমিয়ান। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' বোহেমিয়ানিজম আছে তবে স্বতন্ত্র। জীবনের ব্যর্থতা ও মৃত্যু যেন নিত্যসঙ্গী — সব কিছু যেন রিক্ত, নিয়মতাড়িত। মনীন্দ্রলাল বসুও তাঁর প্রথম গল্প সংকলন 'মায়াপুরী' (১৯২৩)তে সমকালের অসুস্থ যুব সমাজের অস্থিরতা ও অবক্ষয়ের ছবি এঁকেছেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'বেদে' (১৯২৮) উপন্যাসে নায়কের বোহেমিয়ান প্রকৃতি যা সময় সঞ্জাত উৎকেন্দ্রিক মানসিকতার রূপায়ণ; রমেশচন্দ্রের 'চক্রবাক' (১৯৪৫) উপন্যাসের তার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। তাঁর 'যৈবন', 'কাশ্মীরি তুষ', 'কোষ্টাকী পাশা', 'খোসা' ইত্যাদি গল্পে তৎকালীন যুগধর্ম সুন্দর ভাবে ধরা পড়েছে। তবে রমেশ-মানসের গড়নটি ছিল ভিন্ন ছাঁদের। তাঁর লেখক-সত্তা এক আলাদা প্রত্যয়ে উন্নীত ছিল। এখানে শুধু এটুকুই বলে নেওয়া প্রাসঙ্গিক যে, প্রবহমান সময় ও সমকালীন সমাজ তাঁকে যে প্রভাবিত করেছিল 'চক্রবাক' উপন্যাস ও উল্লিখিত গল্পগুলি তার থেকে ব্যতিক্রম কিছু নয়।

ত্রিশের দশকে এদেশের রাজনীতিতে গান্ধীজীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। সে আন্দোলনও বিস্তৃত আকার নেয়। বাংলাদেশে সেই আন্দোলনের জোয়ার প্রবল ভাবে দেখা দেয়। গান্ধীজীর অহিংস পথে সুদিন আনবার বিশ্বাসে জনগণ আবার আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে। তারাশঙ্কর, সতীনাথ ভাদুড়ীর মত ঔপন্যাসিকরা তাঁদের লেখার মধ্য দিয়ে সেই সময় চেতনাকে ফুটিয়ে তুলতে অগ্রসর হন। এভাবে — "মহাযুদ্ধের পর বাংলা সাহিত্যে নতুন সুর শোনা গেল। এর কারণও অনুমান করা কঠিন না। রাজনৈতিক আন্দোলন তীব্রতর হয়েছে, সে আন্দোলনও শুধু বাংলাদেশ নিয়ে নয়। গান্ধীজীর নেতৃত্বে আন্দোলন নিল এক সর্বভারতীয় রূপ। হয়তো প্রত্যক্ষ ভাবে আন্দোলনই উপন্যাসের বিষয় হিসেবে সব সময়ে আসে নি কিন্তু চিত্ত ক্ষেত্রের বিস্তার এবং সমস্যা চিন্তার গুরুত্ব এর দ্বারা বদলে গিয়েছে সন্দেহ নেই। তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী', 'গণদেবতা' সমাজের এই চেতনাকে বহন করছে।" ('বাঙালীর সাহিত্য', ভবতোষ দত্ত, পৃঃ - ২৬৪) রমেশচন্দ্রও তাঁর 'শতাব্দী', 'কুরপালা' উপন্যাসে গান্ধীবাদী আন্দোলনের রূপরেখাকে পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

গান্ধীজীর আইন অমান্য আন্দোলনের গতিধর্মে ভারতবাসী নূতন দিনের আগমন প্রত্যাশায় আশান্বিত হয়েছিল। কিন্তু ত্রিশের দশকেই সেই আশা-দ্বীপের অন্তর্দেশে বইছিল সময়ের চোরা স্রোত। প্রথম গোলটেবিল ব্যর্থ হলে অতঃপর দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক শুরু হয়। "মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়ণের জন্য প্রবল চাপ সৃষ্টি করলে দ্বিতীয় অধিবেশনও কোন সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকেই শেষ হয়। এরপর বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড ১৯৩২ এর ১০ই আগষ্ট ঘোষণা করেন সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ। এই রোয়েদাদে ভারতকে একটি জাতি হিসাবে গ্রহণ না করে বিভিন্ন ধরণের স্বার্থের পৃথক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয়।" ('ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন', বদরুদ্দীন উমর, চিরায়ত প্রকাশন প্রা. লি., ১৯৮৪, পৃঃ ৯০) ১৯৩৭ সালে হিন্দু ও মুসলমানের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের চরিত্র বৈশিষ্ট্য আত্মঘাতী সময়কে চিনিয়ে দেয়। '৪৭-এর ভারত ভাগের অনিবার্য পরিণামের ভ্রূণ-বীজ প্রতক্ষত তিরিশের দশকেই যে শেকড় মেলেছিল — এ কথা বলা যায়। চিত্তরঞ্জনের অনুসারী হিসেবে সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনীতিতে আগমন জাতীয় আন্দোলনে নূতন মাত্রা যোগ করেছিল। কিন্তু তিনিও শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। ১৯৩৯ এর ২৯ শে এপ্রিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। আর এ বছরই ১লা সেপ্টেম্বর শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ভারতকে এই যুদ্ধের একটি পক্ষ হিসেবে বৃটিশ সরকার ঘোষণা করেন। ফলে বিশ্বরাজনীতির দাবাখেলায় অন্তর্দ্বন্দ্বমুখর ভারতের অবস্থা

আরো সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্রে জাতীয় কংগ্রেস, তৎকালীন কম্যুনিস্ট পার্টি এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের কর্ণধার সুভাষচন্দ্র বসুর দৃষ্টিভঙ্গীতে দূরত্ব ছিল। সেই ভাব-সংঘর্ষের সংকটে ভারতবাসীরা প্রায় দিশেহারা ছিল। আর এই পর্বেই বাংলার বুকে দেখা দেয় মহামন্বন্তর। যুদ্ধের প্রয়োজনে সীমান্ত এলাকা সিল করে দেয় সরকার, নৌকো বাজেয়াপ্ত করে। মেদিনীপুরে বিধ্বংসী ঝড় আছড়ে পড়ে। তদপুরি শস্যহীনতা ইত্যাদি মিলিয়ে সেদিন বাঙালীর জীবনে মহা-দুর্দিন ঘনিয়ে এসেছিল। '৪৩ এর ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কে অমর্ত্যসেন লিখেছেন — "১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মহামন্বন্তরে বাংলার প্রায় তিরিশ লাখ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। তখন দেশের জনগণের জন্য মাথা পিছু যে পরিমাণ খাদ্যের জোগান তা এমন কিছু কম নয়। সত্যি বলতে কি, সেই মাথা পিছু খাদ্যের পরিমাণ ছিল ১৯৪১ সালের তুলনায় ৯ শতাংশ বেশি। কিন্তু ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে কোন দুর্ভিক্ষ হয় নি।" ('জীবন যাত্রা ও অর্থনীতি', অর্থনীতি গ্রন্থমালা - ৭, অমর্ত্য সেন, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪০৫, পৃঃ - ১১০) অর্থাৎ সেই মন্বন্তর যত না প্রাকৃতিক দুর্যোগ তার থেকেও বেশি ছিল যুদ্ধোত্তর মুদ্রাস্ফীতি, কালো বাজারীদের দৌরাত্ম্য, তথা ব্যাপক দূর্নীতিজনিত কারণ। যার জন্যে উত্তর কালে এই দুর্ভিক্ষকে অনেকেই কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট বলে মনে করেন। সেই দুর্ভিক্ষ বাঙালী জাতিকে প্রায় পঙ্গু করে দিয়েছিল। গ্রাম জীবনে তথা নিম্নবিত্তের উপর মন্বন্তরের আঘাত ছিল অকল্পনীয়। অমর্ত্য সেনের ভাষায়, "বাংলার '৪৩ এর মন্বন্তর মরণ-আঘাত হেনেছিল ভূমিহীন কৃষক, জেলে আর কিছু উপজীবী মানুষের উপর। বাকি অনেকের প্রায় কিছুই ক্ষতি হয় নি। কিছু মানুষের স্বচ্ছলতা তো বেড়েই গিয়েছিল। ... আসলে বাজারে অধিকারের অসম ক্ষমতাই এক দলের কাছ থেকে খাবার ছিনিয়ে নেয়, আর সেই সব মানুষ শেষ হয়ে যায়।" ('জীবন যাত্রা ও অর্থনীতি', পৃঃ ১৫৬ - ১৫৭) '৫০ এর মন্বন্তর সমকালীন লেখকদের গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছিল। 'মহামন্বন্তর' গল্পসংকলনের ভূমিকায় গোপাল হালদার লিখেছেন, — বেদনার যে তীব্রতা ও নিষ্ঠুরতা, সমসাময়িক লেখকদের চেতনাকে অস্থির ও বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল যে তা ভবিষ্যৎ শিল্পীরা এমন করে উপলব্ধি করতে পারবেন না। সমধর্মী শিল্পীদের চেতনায় এই মন্বন্তর গভীর দাগ রেখে গেছে। প্রবোধ স্যানালের 'অঙ্গার', মনোজ বসুর 'দুঃখ নিশার শেষে' - গল্প সংকলন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রঙিন ঘাট' গল্পে সেই সময়ের বাস্তব চিত্র জীবনবোধের সমন্বয়ে ধরা পড়েছে। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকে খাদ্যাভাব এবং অর্থবৈভবে বিপরীত ছবি লেখকের অভিজ্ঞতার রঙে অদ্ভুত ভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। গোপাল হালদারের 'ঊনপঞ্চাশী', 'পঞ্চাশের পর', 'তেরশ পঞ্চাশ' উপন্যাসে, তারাশঙ্করের 'মন্বন্তর' উপন্যাসে, বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের 'অশনি সংকেত'

উপন্যাসে আমরা দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের জীবন যন্ত্রনার হাহাকার শুনতে পাই। রমেশচন্দ্র সেনও 'ভাত', 'অপিসের ধুতি', 'প্রেত' ইত্যাদি গল্পে সমকালীন মানুষের বীভৎস - বাস্তবকে তুলে ধরেছেন। 'শতাব্দী' উপন্যাসেও দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া সম্পাত লক্ষ করা যায়। 'গৌরীগ্রাম' এর পটভূমিতে বার বার সে প্রসঙ্গ প্রতীকী আবেদন নিয়ে উঠে আসতে দেখা যায়। অন্নাভাব এবং চোরা কারবারের ঘটনা এই উপন্যাসটিতে ভিন্ন মাত্রা এনে দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং পঞ্চাশের মন্বন্তর প্রত্যন্ত গ্রাম বাংলা থেকে কোলকাতা নগর জীবন পর্যন্ত যে বিপর্যয় ডেকে এনেছিল তা সমগ্রতায় ধরবার চেষ্টা করেছেন এই সময়কার ঔপন্যাসিকবৃন্দ। রমেশচন্দ্রও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে লক্ষ্যে স্থির রেখে চল্লিশের দশকে এই আর্ত সময়কের তাঁর উপন্যাস সাহিত্যে তুলে ধরেছেন।

বিশ্বযুদ্ধের কালে ভারতের রাজনৈতিক তৎপরতা ব্রিটিশ সরকারকে ভাবিয়ে তোলে। ভারত ছাড়ো আন্দোলন, আই. পি. টি. র জন্ম ও তার কর্ম তৎপরতা, আজাদ-হীন বাহিনীর মনিপুর প্রবেশ, নৌবিদ্রোহ ইত্যাদি একটির পর একটি প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করতে ব্রিটিশ সরকারেকে রীতিমত হিমসিম খেতে হয়। বাধ্য হয়ে ইংরেজ শাসককে ভারতের স্বাধীনতা দেবার কথা ভাবতে হয়। এদিকে অন্তরবর্তী সরকার গঠনে কংগ্রেস ও মুসলীম লিগের মধ্যে মতানৈক্য ঘটে। জিন্নাহ ১৯৪৬ সালে ১৪ই আগষ্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' এর ডাক দেন। ২০ তারিখ পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। সরকার পক্ষ তা আয়ত্তে না এনে উল্টো রকমের ইন্ধন জোগায়। এ প্রসঙ্গে বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন "ব্রিটিশ সরকার সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোর উদ্দেশ্যে নানা কৌশল অবলম্বন করে, এবং কোলকাতার পর নোয়াখালি, বিহার ও পাঞ্জাবেও তাদের ইন্ধনে ও পরোক্ষ হস্তক্ষেপের ফলে একের এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়।" ('ভারতের জাতীয় আন্দোলন', পৃঃ ১২২) শেষ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলিমের বিভাজনের ভিত্তিতেই ভারত ভাগ হয় এবং সাতচল্লিশ সালে এদেশের স্বাধীনতা আসে। বাংলাও সেই সঙ্গে দ্বিখন্ডিত হয়। ১৯০৫ সালের পরিকল্পনা এত দিনে বাস্তবায়িত হল। এ আঘাত বাঙালি জাতির মর্মমূলকে বিধ্বস্ত করে দেয়। বাংলার সমাজ জীবনের এতদিনকার আদলটি সর্বাংশে বিপর্যস্ত হল। "যুক্ত বাংলার অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে ছিল একটা ভারসাম্য। পূর্ব বাংলা ছিল কৃষি প্রধান। সে জন্য পূর্ব বাংলা ছিল খাদ্যশস্য ও কাঁচা মালের আড়ত। আর পশ্চিমবাংলা ছিল শিল্প প্রধান অংশ। পশ্চিমবাংলাকে খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের জন্য পূর্ব বাংলার ওপর নির্ভর করতে হত। দ্বিখন্ডিত হবার পর এই আর্থিক ভারসাম্য ভেঙ্গে গেল।" ('বাংলা ও বাঙালির বিবর্তন', ডঃ অতুল সুর, সাহিত্যলোক, ১৯৯৪, পৃঃ - ৩৫৩) এবং সেই সঙ্গে

"বাঙালী ভারত রাষ্ট্রে মাত্র একটি ক্ষুদ্র জাতি সত্তায় পরিণত" ('সংস্কৃতির রূপান্তর', গোপাল হালদার, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী, ১৩৯০, পৃ: - ২৪৫) হল। সমরেশ বসু 'আদাব' গল্পে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গাকে যেমন মানবিকতার প্রশ্নে দাঁড় করিয়েছেন, রমেশচন্দ্রের 'সাদা ঘোড়া' সেই সম পর্যায়েরই শিল্পকৃতি। 'পূব থেকে পশ্চিমে' (১৯৫৬) উপন্যাসে দেশ ভাগের মর্মন্তুদ পরিণামকে তিনি সহানুভূতির সঙ্গে এঁকেছেন। সামগ্রিক ভাবে দেখলে তাই বলা যায় দেশকালের পটভূমি রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে শুধু প্রতিফলিতই হয় নি তা উপন্যাস রচনার মূল বিষয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। রমেশচন্দ্র সেই শ্রেণীর লেখক যিনি প্রাত্যহিক জগৎ ও জীবনের ওঠানামা গড়ন ভাঙনকে অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করেন এবং তাকেই বিষয় হিসেবে নিয়ে সাহিত্য রচনা করেন। দেশকালের পটভূমি তাঁর লেখায় শিল্প রূপ নিয়েই উঠে আসে। অনেক লেখক আছেন যাঁদের লেখায় পটভূমি এই গুরুত্ব পায় না। তাঁরা দেশকালে থেকেও তার থেকে সুদূরে অবস্থান করেন। রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে দেশকাল কিন্তু অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই জন্যে তাঁর লেখাকে দেশকালের পটভূমিতে স্থাপন করে বিচার করাই যুক্তিযুক্ত।